

# সতী

দীনেশচন্দ্র সেন

**Published by**

[porua.org](http://porua.org)

## ভূমিকা

দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহ-ত্যাগের উপাখ্যান সকলেই অবগত আছেন, সেই উপাখ্যানটি গল্পচ্ছলে এই পুস্তকে লিখিত হইয়াছে। “বেহুলা” ও “ফুল্লরা” লিখিতে যাইয়া প্রাচীন সাহিত্যের যেরূপ অজস্র উপকরণ দ্বারা আমি সহায়বান্ হইয়াছিলাম, দাক্ষায়ণী সতীর বৃত্তান্ত লিখিতে আমি তদ্রূপ সাহায্য অতি সামান্যই পাইয়াছি। মাধবাচার্য, [মুকন্দরাম](#), [ভারতচন্দ্র](#) ও জয়নারায়ণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন বঙ্গীয় কবি এ সম্বন্ধে যে কিছু বিবরণ দিয়াছেন তাহা অতি সামান্য, আমি তাহা হইতে আহরণ করিবার উপযোগী উপকরণ অতি অল্পই পাইয়াছি। ভারতচন্দ্রের বর্ণিত শিবের ক্রোধ ও দক্ষযজ্ঞ-নাশ—ছন্দের ঐশ্বর্য্য ও ভাষাসম্পদে উক্ত কবির অমর কীর্তিস্বরূপ প্রাচীন কাব্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। কিন্তু ভুজঙ্গপ্রয়াতছন্দ ভাঙিয়া কথাগুলি গদ্যে পরিণত করিলে কবির অপূর্ব শব্দমন্ত্রের মোহিনী শক্তি নষ্ট হয়, সুতরাং অনাদ্যমঙ্গল হইতে আমি উপকরণ সংগ্রহের তাদৃশ সুবিধা প্রাপ্ত হই নাই। অপরাপর বঙ্গীয় কবিগণকৃত এই বিষয়ের বর্ণনা অতি সংক্ষিপ্ত, এমন কি উল্লেখযোগ্যই নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষযজ্ঞের বর্ণনা কতকটা সবিস্তর, আমি তাহাই কথঞ্চিৎ অবলম্বনপূর্বক এই গল্পটি লিখিয়াছি।

এই উপাখ্যানসংক্রান্ত একটি কৈফিয়ৎ আমাকে দিতে হইবে। এ দেশের লোকের প্রচলিত বিশ্বাস যে, মহাদেব যখন সতীকে দক্ষালয়ে যাইতে নিষেধ করিয়া ছিলেন, তখন সতী দশমহাবিদ্যার বিচিত্ররূপ ধারণপূর্বক স্বামীকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। আমি এই অংশ হইতে বর্জ্জন করিয়াছি। সংস্কৃত পুরাণ ও তন্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, একমাত্র মহাভাগবতপুরাণে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব সম্বন্ধে উক্তপ্রকার আখ্যায়িকা পরিদৃষ্ট হয়, অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থে তাহা নাই। কুজিকাতন্ত্র, স্বতন্ত্র তন্ত্র, নারদপঞ্চরাত্র প্রভৃতি বহুসংখ্যক প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাবের কারণ ভিন্নরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় বিশেষ বিশেষ অসুর নিধনকালে কিংবা অপর কোন প্রকার ঘটনায় পড়িয়া দেবী দশমহাবিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন—দক্ষালয়ে যাওয়ার উপলক্ষে তাঁহার দশমূর্তির কল্পনা একমাত্র পূর্বকথিত মহাভাগবতপুরাণেই দৃষ্ট হয়; দক্ষযজ্ঞের সম্বন্ধে শিবপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতের আখ্যায়িকাই বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য, তাহাতে দশমহাবিদ্যার কল্পনা নাই। শুদ্ধ মহাভাগবত-পুরাণের উপর নির্ভর করিয়া [ভারতচন্দ্র](#) প্রভৃতি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণ দশমহাবিদ্যার বৃত্তান্ত সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন এবং তজ্জন্যই এ দেশে সেই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়াছে।

আশা করা যায়, একমাত্র সংস্কৃত পুরাণের নজির গ্রহণ না করার অপরাধে গল্পলেখককে বিশেষরূপে দোষী সাব্যস্ত করা হইবে না। কবির **হেমচন্দ্র** তাঁহার দশমহাবিদ্যানামক কাব্যে দশমহাবিদ্যার আবির্ভাব সতীর দেহত্যাগের পরবর্তী বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণরূপে তাঁহার কল্পনায় সৃষ্টি। আমি সতীর চিত্র যে ভাবে চিত্রণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছি, তাহাতে দশমহাবিদ্যার সঙ্গতি রক্ষণ করা আমার পক্ষে কঠিন হইত, এজন্যই আমি উহা বর্জন করিয়াছি এবং এ সম্বন্ধে প্রায় সমস্ত সংস্কৃত গ্রন্থোক্ত বিবরণ যখন আমার অনুকূলে, তখন আমি লিখিতে যাইয়া স্বয়ং কোনরূপ দ্বিধা বোধ করি নাই।

প্রাচীনকালে স্বামীর প্রেম ও রমণীর পাতিব্রত্যের যে আদর্শ বঙ্গীয়সমাজের সম্মুখে ছিল, এই গল্পে যদি তাহার আভাস দিতে সমর্থ হইয়া থাকি, তবেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। আমাদের সর্ববিষয়ে প্রাচীন আদর্শ কি ছিল, তৎসঙ্গে শিক্ষিতসম্প্রদায়ের পরিচয় স্থাপন করা উচিত—তাহা হইলেই আমরা বর্তমানের উপযোগী সমাজ গঠনের সদৃঢ় ভিত্তিভূমি পাইব, নতুবা পদীর বক্তৃতা শুনিয়া কাফ্রি বা সাঁওতালের ন্যায় একবারে নিজস্ব হারাইয়া—নব্য-সভ্যতার গ্রাসে পতিত হওয়া শ্লাঘার বিষয় নহে। সেই পরিচয়স্থাপনের চেষ্টা কি সাহিত্য, কি সমাজ, কি শিল্প, সকল দিক দিয়াই প্রত্যেক স্বদেশভক্তের প্রযত্নের বিষয় হওয়া উচিত। সাহিত্যক্ষেত্রে এই লক্ষ্যই আমার সামান্য লেখনীকে প্রেরণা দান করিয়াছে।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন

---

ভূগু-প্রজাপতির গৃহে মহাযজ্ঞ—অগ্নিরা, মরীচি প্রভৃতি দেবর্ষিগণ মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। রাত্রিকালে চন্দ্র ও দিবসে সূর্য্য পর্য্যায়-ক্রমে দ্বারদর্শী পদ গ্রহণ করিয়াছেন। দেবসভায় বিষ্ণু মাল্য-চন্দন পাইয়া যজ্ঞের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, এবং দেবরাজ ইন্দ্র কৰ্ম্মকর্ত্তরূপে অভ্যাগতদিগকে আদরে আপ্যায়িত করিতেছেন। স্বয়ং ব্রহ্মা সপ্তর্ষিমণ্ডল ও বৃহস্পতির সঙ্গে শাস্ত্র-বিচার জুড়িয়া দিয়াছেন; উনকোটি তাহার হস্তে আলো রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহার বিশেষ করিয়া রন্ধনশালা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, বরুণ ভৃগুরহস্তে নবাগত দেবগণের পদ-প্রক্ষালন করিতেছেন। কপিলাগাভী অজস্রধারায় দুগ্ধ প্রদান করিতেছে এবং বিষ্ণুদূতগণ সেই দুগ্ধ হইতে সদ্যঃ হব্য প্রস্তুত করিতেছে। সেই হব্যে পুষ্ট হইয়া হোমাগ্নি জ্বলিতেছে।

যমরাজের সঙ্গে অশ্বিনী-কুমারদ্বয় আয়ুর্বেদ সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপন করিয়াছেন। যমরাজ মাণিক্য-মণ্ডিত একটা নস্যাদার হইতে নস্য গ্রহণ করিয়া অনেক কথা শুনিয়া দুই একটি উত্তর দিতেছেন। তাঁহার রথবাহক স্বর্ণ-শৃঙ্গ কৃষ্ণকায় মহিমপ্রবর ব্রহ্মার অঙ্গের রক্তজ্যোতিঃ দেখিয়া ক্রোধে বোমাধিত হইতেছে। শূলপাণি সভার একটু দূরে উদ্বনেত্র হইয়া বসিয়া আছেন—যেন প্রশান্ত রজতগিরি। সেই শ্বেতকান্তি সৌম্যমূর্ত্তি বেষ্টন করিয়া যে রক্তচক্ষু সপরিবাজ চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিল, সহসা সে বিষ্ণুরথবাহী গরুড়কে দেখিয়া ভয়ে মহাদেবের সিদ্ধির থলিয়ার ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিতেছে। মহাদেবের পার্শ্বে বৃষভবর অর্দ্ধনিম্নীলিত-চক্ষু স্বীয় প্রভুকে দর্শন করিতেছে। বৃষের মূর্ত্তি কতকটা শিবের ন্যায়ই শান্ত।

রন্ধনশালায় মূর্ত্তিমতী শ্রী। শত শত অন্নমেরু; ঘৃত, মধু, দুগ্ধ, দধির সরোবর। “ভূজ্যতাং দীয়তাং” শব্দ আকাশ ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। যজ্ঞশালা সুক্, শুব, দণ্ডাদির সংঘট-শব্দ এবং অগ্নিহোত্রী ও ঋত্বীক্গণের মন্ত্রপাঠে মুখরিত। সমিধ্ ও কুশ শকটে শকটে আহত হইতেছে। অষ্টবসু বস্তু ও ধন দান করিয়া তিলমাত্র অবসর পাইতেছেন না।

দেব-যজ্ঞ এই ভাবে নির্বাহিত হইতেছে। এমন সময়ে ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র দক্ষ প্রজাপতি সেই সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন।

দক্ষ দান্তিক-প্রকৃতি, উন্নত-তেজপুঞ্জ বপুঃ। ব্রহ্মার আদরে তিনি জগৎকে নগণ্য মনে করেন। দেবগণের অতিমাত্র বশ্যতা ও নম্র ব্যবহারে তাঁহার দান্তিকতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র দৌহিত্র সূর্য্য ও ইন্দ্র, এবং জামাতা ধর্ম্ম, অগ্নি, চন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দ তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন; সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দক্ষ সমাগত দেববৃন্দকে সহাস্যবদনে শিরো সঞ্চালনপূর্ব্বক কথঞ্চিৎ প্রীতিপ্রফুল্লনেত্রে

অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি ইঙ্গিতে দেবগণকে বসিতে অনুমতি প্রদান করিলে তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া উপবেশন করিলেন। তিনজন তাঁহাকে দেখিয়া উত্থান করেন নাই। ব্রহ্মা—দক্ষের পিতা, বিষ্ণু-পিতৃসখা, ইহারা দক্ষের নমস্য। কিন্তু শিব দক্ষদুহিতা সতীকে বিবাহ করিয়াছেন। তিনি জামাতা, তিনি শ্বশুরকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়ান নাই, বা প্রণাম করেন নাই। জামাতার এই ব্যবহারে দক্ষের মুখমণ্ডল বোষ-দীপ্ত হইল, তাঁহার ললাট হইতে স্ফুলিঙ্গের ন্যায় জ্বালা নিঃসৃত হইতে লাগিল। তিনি বিরূপাক্ষের দিকে সঘৃণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, “শিব, তোমার এত বড় আশ্পর্ক! আমার কন্যাকে বিবাহ করিয়া তুমি দেবসমাজে স্থান পাইয়াছ। নতুবা তুমি যে প্রকৃতির লোক, তোমায় দেবতাসমাজে অপাংক্ত্যে হইয়া থাকিতে হইতে। তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ, তাহা কেহ জানে না, তোমার গোত্র ও কুলের পরিচয় নাই। তোমার আচার ব্যবহার জঘন্য, তুমি শ্মশানে থাক, ঘৃণিত ভিক্ষাবৃত্তি তোমার ব্যবসায়, একটা ঘাঁড়ের উপরে চাপিয়া তুমি সাপ লইয়া খেলাও। কোন্ পার্বত্য সাপুড়ে দেশ হইতে তুমি আসিয়াছ, তাহা জানি না। বসন-ভূষণ নাই—দিগম্বর, সময়ে সময়ে দুর্গন্ধ বাঘছাল পরিয়া থাক। এই ঘৃণিত আচরণ দেবসমাজে অতি নিন্দিত। আমার দিকে চাহিয়া তাঁহারা তোমায় কেহ কিছু বলেন না। দেখ, আমার জামাতা চন্দ্রকে দেখ—যেমন মধুর প্রকৃতি, তেমনি বিনয়ী—যেমন রূপবান, তেমনি গুণশীল। তাঁহার রূপের গুণে দেব-সভা উজ্জ্বল, বিশ্ব উজ্জ্বল। অগ্নি ও ধুম্র ইহারাও জামাতা, ইহারা ত্রিদিব উজ্জ্বল করিয়া আছেন। আর তাঁহাদের পার্শ্বে জাতিহীন, কুলহীন, বৃষবাহন, নগ্নকায়, ক্ষিপ্ত ভিক্ষুককে জামাতা বলিয়া পরিচয় দিতেও ঘৃণা হয়। তোমার অহঙ্কারের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছে, তাহা একেবারে আমি চূর্ণ করিব।”

এই উক্তিযে বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ লজ্জিত হইলেন। কিন্তু দক্ষ ব্রহ্মার অতি প্রিয়, এই জন্য সকলেই কেবল মাথা হেঁট করিয়া রহিলেন। স্বয়ং ব্রহ্মা অতিমাত্র পুত্রবাৎসল্যে প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন।

দক্ষ যখন শিবের নিন্দাবাদ করিতেছিলেন, তখন ভৃগুর মুখে উল্লাসের চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। ভৃগুর গৃহেই যজ্ঞ—গৃহপতি দক্ষের কথায় সায দিলেন। তৎসঙ্গে পুষা প্রভৃতি ঋষিগণও মহাদেবের নিন্দায় বেশ আমোদ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহারা শিবনিন্দা শুনিয়া অনুকূল ভাবে ঘাড় নাড়িতে লাগিলেন। উৎসাহিত হইয়া দক্ষ মহাদেবের প্রতি যথেষ্ট কটুক্তিবর্ষণ করিলেন।

বৃষভের পার্শ্বে শূলহস্ত নন্দী দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সর্বদেহ ক্রোধে কম্পিত হইতে লাগিল। ক্রোধে তাহার দুইটি চক্ষের তারা ছুটিয়া যাইবার মত হইয়াছিল। সে বিষ্ণুর বারিধির ন্যায় অস্ফুট-গর্জ্জন মাত্র করিতেছিল, মহাদেবের ইঙ্গিতে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলিতে সাহস পায় নাই। বৃষটিও যেন শিবনিন্দায় ব্যথিত হইয়া দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ত্যাগ করিতেছিল।

শিব কোন কথাই বলেন নাই, তিনি একবার উর্ধ্বচক্ষু নত করিয়া দক্ষের প্রতি দৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে দৃষ্টিতে ক্রোধ ছিল না, ক্ষমা ছিল।— ব্যথার চিহ্নমাত্র ছিল না, করুণার স্নিগ্ধতা ছিল। দান্তিক দক্ষ ভাবিলেন, শিবের এই ভাব—ঘৃণার ছদ্মবেশমাত্র। তিনি ক্রোধে আরও জুলিয়া উঠিলেন।

যজ্ঞ শেষ হইয়া গেল। যাঁহার ভস্ম ও চন্দনে সমজ্ঞান, এমন মহাদেবের নিকট আদর ও ঘৃণার তারতম্য কি?

জগতের হলাহল একমাত্র শিবই পান করিতে সমর্থ এবং হলাহলসিন্ধু-মহ্ন করিয়া যে অমৃতের উৎপত্তি হয়, একমাত্র শিবই তাহার ভোক্তা। দেবসভা হইতে যে ঘৃণা ও কটুক্তির বর্ষণ হইল, তাহা মর্ষরপ্রস্তরের উপর বারিবর্ষণের ন্যায় তাঁহার চিত্তে কোন রেখা আঁকিয়া গেল না। তাঁহার বিশাল জটাজুটে গঙ্গার যে মৃদু-মধুর কলরব হইতেছিল, আনন্দময়ের তাহাতেই পরমানন্দ জাগিয়া উঠিল। তিনি তাঁহার কর-ধৃত বিষাণ বাদনপূর্ব্বক আনন্দধ্বনিতে আকাশ কম্পিত করিয়া কৈলাসপুরীতে প্রত্যাগত হইলেন। সমুদ্রমহ্নকালে দেবগণ অমৃতের ভাগ পাইয়াছিলেন, শিব বিষ পান করিয়া আসিয়াছিলেন। এবারও তাহাই হইল, ভৃগু সমস্ত দেবগণকে অমৃত তুল্য আদরে আপ্যায়িত করিলেন। অপমানের তীব্র বিষ শিবের প্রতি বর্ষিত হল। কিন্তু শিব-মুখের অর্দ্ধেন্দু-উজ্জ্বল প্রসন্নতা দেখিয়া কে তাহা জানিতে পারিবে?

শুধু নন্দীর মনে সেই তীব্রজ্বালা জুলিতে লাগিল। সপ্তাহ পর্য্যন্ত নন্দী আহার করে নাই। রাত্রিতে নিদ্রা যায় নাই, সিদ্ধি ঘুটিতে ঘুটিতে অতিমাত্র ক্রোধে নন্দী কষ্টী পাথরের আধারগুলি ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। সতী বলিতেন, “নন্দী, তুই সমস্ত অসুরের বল পাত্রগুলির উপর প্রয়োগ করিলে তাহা উহারা সহিতে পারিবে কেন?”

এদিকে শিবের প্রতি দক্ষ-প্রজাপতির ক্রোধ ক্রমেই বাড়িয়া চলিল। ভাবিলেন, এত ভাষা সনা করিলাম, তাহার উত্তরে একটা কথা বলিল না, বেটার একরূপ অভিমান? দেবতারা বলে—ইহার নমস্য কেহ নাই। ইহাতেই মনে হয়, শিব অতি হীনকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে; অমরগণের সুবৃহৎ পরিবার—ইহাতে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের প্রতি মর্যাদা-যুক্ত না হইলে সামাজিক শৃঙ্খলা থাকিবে কিসে? শিব ভুঁইফোড়, শ্বশুর পিতৃতুল্য, তাঁহাকে প্রণাম করিবে না। বৃহস্পতির সঙ্গে অনেক শাস্ত্র ঘাঁটিয়া দেখা গেল, একরূপ বিধি কোথাও নাই।

দক্ষের দল ক্রমেই পুষ্ট ও প্রবল হইয়া উঠিল। তাহার একবাক্যে বলিল, “শিবের আচার দেবসমাজের বিধিবিহীন; আমরা তাহাকে দেব বলিয়া স্বীকার করিব না।”

তাহারা দক্ষের ক্রোধ ক্রমেই উদ্দীপিত করিয়া দিল। একে ত শিবের মৌন-উপেক্ষা-কল্পনায় দক্ষ অত্যন্ত চটিয়া গিয়াছিলেন, তাহার উপর বিকৃতানন নন্দীর রোষকষায়িত সঘৃণ দৃষ্টির কথা মনে পড়িয়া দক্ষ ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া উঠিলেন। তিনি অবশেষে প্রকাশ্য-ভাবে দেবসমাজে এই আদেশ প্রচার করিয়া দিলেন যে, শিবের সঙ্গে আর দেবসমাজ এক পংক্তিতে ভোজন করিবেন না। যজ্ঞের ভাগে শিবের কোন অধিকার থাকিবে না।

সুদীর্ঘ কুটিল শ্মশ্রুগুলি অঙ্গুলি দ্বারা মার্জনা করিতে করিতে ভৃগু বলিলেন, “এবার ভাঙ্গড় জন্ম হইবে, এই ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট হইল।” অষ্টদিক্‌পাল দক্ষ-প্রজাপতির এই আদেশ জগতে প্রচার করিলেন, মহাদেব যজ্ঞভাগ পাইবেন না।

সমস্ত জগৎ এই আদেশে ভীত-স্তব্ধ হইয়া গেল। শিবহীন যজ্ঞ কে করিবে? হৈহয়, যযাতি, মার্কাতা প্রভৃতি রাজরাজেশ্বরগণ সর্বদা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন, শিবহীন যজ্ঞ করিতে তাঁহারা সাহসী হইলেন না। যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মার মুখের দিকে চাহিয়া এই আদেশের প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। অথচ শিবহীন যজ্ঞের ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহার কোনই উৎসাহ রহিল না। দেবগণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নর-জগতে কোন উৎসাহ দিতে পারিলেন না, অথচ দক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও ভরসা পাইলেন না।

যজ্ঞ বন্ধ হওয়াতে অনাবৃষ্টি হইল; পৃথিবীর বর্ণ প্রতাপ্ত তাম্রখণ্ডবৎ ধূসর-রক্ত হইয়া উঠিল। শস্য দন্ধ হইয়া গেল। কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, মনুষ্য—লক্ষ লক্ষ মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। ঋষিগণ হোমকার্য্যে বিরত থাকিয়া তপোভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন। যোগিগণ অন্তশ্চর বায়ু নিরোধ করিতে কষ্ট বোধ করিতে লাগিলেন, যজ্ঞাগ্নিক ধূমে মরুৎ-পরিষ্কৃত না

হওয়াতেও জীবের পক্ষে শ্বাসপ্রশ্বাসক্রিয়া যেন কতকটা আয়াস-সাধ্য হইয়া উঠিল।

রুদ্ধের অপমানে পৃথিবীতে রৌদ্র প্রখর হইয়া উঠিল। ধরিত্রী জ্বালা বোধ করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজগণ ঘন ঘন আর্তনাদ করিতে লাগিল। বালখিল্য ঋষিরা বৃক্ষের আশ্রয়চ্যুত হইতে উদ্যত হইলেন। দিক্‌পালগণ কম্পিতকলেবর হইতে লাগিলেন, তাঁহাদের নেত্রস্পন্দনে মুহূর্মুহ বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিল।

শিব-হীন যজ্ঞে কে সাহস করিবে? পৃথিবী ক্রোধ ও বিদ্বেষের আগার হইয়া উঠিল। কারণ ধর্ম শিবহীন। যাহার উদারান্ন সংস্থানের উপায় নাই, সে বিলাসী হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, কারণ তাহার লক্ষ্য শিবহীন। পরিধেয় ও ভূষণের বাহুল্য হইল—অথচ গৃহে শিশুগণ না খাইয়া মৃতপ্রায়, গৃহ-কর্তার সেদিকে দৃষ্টি নাই কারণ তাহার দৃষ্টি শিবহীন। গৃহকর্ত্রীরা বিলাসিনী হইয়া উঠিল, কারণ শিবহীন গৃহে অন্নপূর্ণার সাধনা কে করিবে? স্বেচ্ছায় কিংবা পরার্থে কেহ কণ্টকের আঁচড় স্বশরীরে সহ করিতে প্রস্তুত নহে, অথচ অসংলস্যজড়িত নিশ্চেষ্ট দেহ পরকৃত সর্বপ্রকার অত্যাচার সহ্য করিতে লাগিল। প্রতারক ধর্ম-যাজকগণ তামসিক ভাবকে সত্য গুণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে লাগিল। বিলাস ও মূঢ়তা চরিত্রকে অধিকার করিয়া বসিল—কারণ ত্যাগী এবং সত্যস্বরূপ শিবের আদর্শ জগৎ হইতে অপসৃত হইল।

ব্রহ্মার সৃষ্টি লুপ্ত হইতে চলিল। প্রশ্ন এই—“দক্ষ চাও না শিব চাও?” জগৎ এই দুয়ের অধিকার সহ্য করিতে অসম্মত। একদিকে দম্ভ, বল, স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রবল দণ্ড-শক্তি—অপর দিকে ত্যাগ, নিবৃত্তি ও ব্রহ্মানন্দ, কোন্‌টা চাই? দক্ষের কঠোর অনুশাসন পৃথিবীর অসহ্য হইল। ভীত, ত্রস্ত এবং মূক জগতের প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল। তথাপি মনের কথাটি উচ্চারণ করিবার সাহস তাহার হইল না—সে কথাটি, “আমরা দক্ষকে চাই না, আমরা শিবকে শিরে ধারণ করিব।”



বিষ্ণু জগতের রক্ষাকর্তা। তিনি নারদকে ডাকিয়া বলিলেন, “ব্রহ্মা ত সৃষ্টি করিয়াই দায় হইতে মুক্ত, এই জগৎকে রক্ষা করা কিরূপ শক্ত তাহা ত তিনি জানেন না। পুত্রটি অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হইতেছে, ইহার দুগতির সীমা পরিসীমা থাকিবে না। আমার সে সকল কথা এখন আশ্বীয়তা-স্থলে না বলাই ভাল, কিন্তু পৃথিবীর রক্ষার একটা উপায় ত করিতে হইবে। তুমি বৈবস্বত মনুর পুত্র প্রিয়ব্রতকে যজ্ঞ করিতে বলিয়া আইল। সে অতি প্রবল রাজা, সাতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছিল, প্রদক্ষিণ-কালে তাহার রথচক্রের ঘর্ষণে পৃথিবী ক্ষয়গ্রস্ত হইয়াছিল, সেই সপ্তবেথা সপ্ত-সিন্ধুতে পরিণত হইয়াছে। প্রিয়ব্রত জগতের রাজকুল-চক্রবর্তী। বিশেষতঃ, সে দক্ষের শ্যালক। সম্ভবতঃ, সে সাহসী হইয়া যজ্ঞারম্ভ করিতে পারে।”

নারদের বীণাধ্বনি শুনিয়া প্রিয়ব্রত দিগ্বিজয়ে যাত্রা স্থগিত করিয়া দেবর্ষির আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। স্বর্গপ্রদেশ অপূর্ব বীণাঝঙ্কারে নাদিত করিয়া দিব্যপ্রভা-মণ্ডিত ঋষিপ্রবর প্রিয়ব্রতের প্রাসাদে অবতীর্ণ হইলেন। নারদ তাঁহাকে গোপনে বিষ্ণুর অভিপ্রায় জানাইলেন। কিছুকাল নীরব থাকিয়া—প্রিয়ব্রত বলিলেন, “যাহার দেহ কোন ভৌতিক উপাদানে নির্মিত নহে, যিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, এমন দেবাদিদেব শিবের নমস্য আবার কে থাকিবে? দক্ষ প্রজাপতি পাগল হইয়াছেন—শিবহীন বিশ্ব দম্ব হইতে উদ্যত, আমি পৃথিবীকে সরস রাখিবার জন্য যে সপ্তসিন্ধু প্রস্তুত করিয়াছি, রুদ্রের অপমানে বারিরাশি ধূমের ন্যায় উড়িয়া যাইতেছে, আর কিছুকাল পরে তাহা শুষ্ক হইয়া যাইবে। শিবহীন বিশ্ব বাস-যোগ্য নহে। আমি শিবহীন যজ্ঞ কখনই করিতে সমর্থ নহি। বিষ্ণু ঘরের কলহ মিটাইয়া আমাকে যে আদেশ করিবেন, তজ্জন্য আমি সকলই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু দেবসমাজের এই বিদ্বেষ-বহিতে পুড়িয়া মরিবার জন্য আমিই সর্বপ্রথম পতঙ্গ হইতে স্বীকৃত নহি।”

বীণা বাজাইতে বাজাইতে নারদ বিষ্ণুকে যাইয়া প্রিয়ব্রতের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। বিষ্ণু এই সংবাদে একটু চিন্তাঘ্রিত হইয় পড়িলেন।

‘দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং প্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন না কেন? দক্ষ প্রজাপতি, বৃহস্পতি, ভৃগু ও সপ্তর্ষিগণলী তাঁহার সহায়, তিনি দক্ষের দৌহিত্র; ভীত হইবার পাত্র নহেন। নারদ, তুমি দেবরাজকে আমার আদেশ জানাইয়া আইস। দেবরাজ স্বয়ং যজ্ঞ করিলে নরলোকে যজ্ঞানুষ্ঠানে আর কোন বাধা থাকিবে না।’

ইন্দ্র নারদকে বলিলেন, “আমি শিবহীন যজ্ঞ সর্বপ্রথম করিতে সাহসী নহি। শিবের পিণাক অমরাবতীর সর্বপ্রথম ভিত্তিস্বরূপ। ত্রিপুরাসুরকে বধ করিয়া এই সিংহাসনে শিবই আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। বিষ্ণু আমাকে কেন এই বিপজ্জনক ব্রতে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিতেছেন?

দেবগণ বহুদিন যজ্ঞভাগ পান নাই—তাঁহারা ক্ষীণপুণ্য হইয়া পড়িতেছেন, কিন্তু আমি কি করিব? আমি এ সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি অন্যত্র চেষ্টা দেখুন।”

নারদ এই উত্তর লইয়া আর বিষ্ণুর নিকট গেলেন না, তিনি স্বয়ং আর একটা উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

দক্ষের গৃহে উপনীত হইয়া নারদ দক্ষকে প্রণামপূর্বক দাঁড়াইয়া রহিলেন। দেবশিল্পিনির্মিত বহুমূল্য রোমজ পরিচ্ছদে দক্ষের সুদীর্ঘ দেহ মণ্ডিত, তাঁহার কাণ্ডিতে প্রখর দেব-প্রভা, তাহা হইতে সৌরকরজ্বালা বিচ্ছুরিত। ললাটের শিরা স্ফীত, নেত্রে দর্প, ওষ্ঠ ও হনুতে বাগ্মিতার চিহ্ন। অহঙ্কারে স্ফীত মুখমণ্ডলে সর্বদা জগতের প্রতি উপেক্ষার ভাব বিদ্যমান। নারদকে দেখিয়া দক্ষ প্রজাপতি বলিলেন, “নারদ, তুমি কি শোন নাই, পিতা আমায় সমস্ত প্রজাপতিগণের উপরে আধিপত্য প্রদান করিয়াছেন। তোমার ঘটকালীতে সতী-মেয়েটাকে একেবারে ভরাডুবি করিয়াছি, ভাস্কর বেটা বিশেষ অপদস্থ হইয়াছে। দেবসমাজে আর তাহার স্থান নাই, যজ্ঞভাগ কেহ আর তাহাকে দেয় না—সে একেবারে দেবসমাজ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে।”

নারদ বলিলেন, “শিব আর কি অপদস্থ হইয়াছেন! শিবহীন যজ্ঞ আর কেহই করিতে সাহস পাইতেছে না। আপনার নিষেধ-বিধিতে এই লাভ হইয়াছে, দেবতাদের মধ্যেও আর কেহ যজ্ঞভাগ পাইতেছেন না। তাঁহারা ক্ষীণ-পুণ্য হইয়া পড়িয়াছেন। ধরিত্রী যজ্ঞহীন হইতে প্রপীড়িত হইতেছেন। পুষ্কর, শম্বর ও আবর্ত প্রভৃতি মেঘমণ্ডল অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। মহার্ঘ জলহীণ হইয়া যাইতেছেন। বরুণের রাজ-কোষ শূন্য। হোমাগ্নির অভাবে মৰুৎ-মণ্ডল দূষিত হইয়া পড়িয়াছে। শিবের কিছুই ক্ষোভ হয় নাই। নন্দী সিদ্ধি ঘুটিতেছে, আপনার ভাস্কর জামাতার চিরাভ্যস্ত মহানন্দের কোনই ত্রুটি নাই। বিষাণে ওঙ্কার ধ্বনিত হইতেছে এবং কর্ণাবলম্বী ধুস্তুর-পুষ্পের ঘ্রাণে তিনি মাতোয়ারা হইয়া আছেন।”

দক্ষের ক্র কুণ্ঠিত হইল, তিনি গর্জিত কণ্ঠে বলিলেন, “কি? আমি প্রজাপতিগণের অধীশ্বর দক্ষ সহায় থাকিতে শিবহীন যজ্ঞ করিতে কেহ সাহসী হইতেছেন না? এ বড় আশ্চর্য্য কথা। যাহা হউক, আমি এই বিষয়ের উদ্যোগী হইয়া দেবসমাজকে শিক্ষা দিব। নারদ, তুমি প্রচার করিয়া দাও, আমার গৃহে বাজপেয় ও বার্ষ্পত্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইবে। ত্রিজগৎ নিমন্ত্রিত হইবে। সুধু কৈলাসপুরী বাদ দিয়া তুমি সর্বত্র নিমন্ত্রণ প্রচার কর।”